wn‡iwkgv WvBwi

†dvW Mwoi wWRvBbvi KvRx Bmjvg

নির্মলেন্দু গুণ

আমি জন্মগ্রহণ করি ১৯৪৫ সালের ২১ জুন। ঐ বছরেরই ৬ আগস্ট আমেরিকা জাপানের হিরোশিমায় তাদের নব-আবিষ্কৃত পরমাণু বোমা 'লিটল বয়'-এর বিস্ফোরণ ঘটায়। আমার জন্মের এক মাস ষোল দিনের মাথায় মানব-সভ্যতার ইতিহাস-কাঁপানো এই চরম-বর্বর ঘটনাটি ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরিচালনাকারী আমেরিকার তৎকালীন 'বিগ বয়'রা তাদের নব-আবিষ্কৃত পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়াবহ ধ্বংসক্ষমতাসম্পন্ন পরমাণু অস্ত্রটির জন্য 'লিটল বয়' নামটিকে কেন বেছে নিয়েছিলেন? 'উপহাস/বিদ্রূপ' এরকম কিছু সমার্থক শব্দ দিয়েই কেবল ঐরকম নামকরণের মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিটা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। মানবজাতি আজ পর্যন্ত যুদ্ধবাজ আমেরিকার ঐরূপ বিকৃত মানসিকতার বিরুদ্ধে যথেষ্ট ধিক্কার জানাতে পেরেছে বলে আমার মনে হয় না।

নিজে কখনও শিশু ছিলাম, সত্য হলেও এ-কথা ভাবতে আমি কিছুটা লজ্জিত বোধ করি। তাই শিশু শব্দটি ব্যবহার না করে, ছোট শব্দটি ব্যবহার করলাম। এমন দাবি করবো না যে, তখন বড় থাকলে, আমেরিকার পরমাণু বোমার আঘাত থেকে আমি বাঁচাতে পারতাম হিরোশিমাকে। তবে এটা ঠিক, তখন বড় থাকলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ-মার্কিন জোটকে নয়, বন্দি ভারতমাতাকে ব্রিটিশের দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর গৃহীত পদক্ষেপের প্রতিই আমি সমর্থন জানাতাম। আমার বাবার মতো আমিও সমর্থন করতাম জাপানকেই। আমার বাবা ভারতীয় কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন। তবে ছিলেন ঠিক ততদিনই, যতদিন ভারতীয় কংগ্রেসে ছিলো সুভাষের কংগ্রেস। গান্ধী-নেহরুর কংগ্রেস নয়। নেতাজী নেই তো আমার বাবাও নেই। বাবা নেই তো আমিও নেই।

সেই হিরোশিমা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অনিবার্য-অন্তিম মুহূর্তে সোভিয়েট ইউনিয়নকে অন্ধকারে রেখে, মরহুম চার্চিলের অনুমোদনক্রমে পরিচালিত ইঙ্গ-মার্কিন বর্বরতার চিরসাক্ষী হিরোশিমা।

এতোদিন শুনিয়াছি নাম, এবার নিজের চোখে দেখিয়া এলাম। প্রথমবার জাপানে

গিয়েও হিরোশিমায় যেতে পারিনি। ছয় মাসের ব্যবধানে সম্পন্ন আমার দ্বিতীয় জাপান-ভ্রমণের সুযোগে (১৫ মার্চ-১৬ মার্চ, ২০০৪) সেই অপরাধ মোচন করা গেলো।

হিরোশিমাকে নিয়ে পরে বিস্তারিত লিখবো বলে আশা রাখি। আমার এ লেখাটি হিরোশিমা-বিষয়ে নয়। এই রচনাটি, হিরোশিমায় যাদের অনাবৃত অন্তরের আন্তরিক-আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম, তাদের নিয়ে, আরও বিশেষভাবে তাদের একজনকে নিয়ে।

১৫ মার্চের গোধূলিলগ্নে জাপানের বিস্ময়-আবিষ্কার বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন বুলেট ট্রেনে (জাপানি ভাষায় সিনকানসেন) চড়ে আমি কিয়োটো থেকে হিরোশিমা রেল সেটশনে পৌঁছাই। আমাকে সেই বিরাট রেল স্টেশন থেকে যথাসময়ে উদ্ধার করতে উপস্থিত হয় মিজান। মিজানকে আমি চিনি না, ফোনে তার সঙ্গে কথা হয়েছে বেশ ক'বার। কণ্ঠস্বর থেকে ঝরে পড়া আন্তরিকতার টানে মিজানের একটা হাসি-খুশি চেহারা আমি কল্পনায় তৈরি করে নিয়েছি। মিজানের বড় ভাই ডা. আবদুর রহমান পাখি আমার অত্যন্ত প্রীতিভাজন। ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজে যখন সে পড়াশোনা করতো, তখন আমাদের ধোপাখোলার বাসায় প্রায়ই আসতো। পাখির বিয়েতেও আমি গিয়েছিলাম। পাখির ছোট ভাই মিজান। বাংলাদেশে প্রথমে ইঞ্জিনিয়ারিং ও পরে

ফোর্ড মোটর কোম্পানি

শুরু থেকে বর্তমান

ঠিক ১০১ বছর আগে হেনরি ফোর্ডের হাতে পুঁজি ছিল তিনটি। ২৮ হাজার ডলার। ১১ জন শেয়ার হোল্ডার এবং একটি স্বপ্ন।

এক শতাব্দী পর ফোর্ড বেঁচে নেই। কিন্তু তার পরিবারের হাতে রয়েছে ২৭ বিলিয়ন ডলারের সম্পদ। ৩ লক্ষাধিক শেয়ার হোল্ডার। আর সেই স্বপ্নটি? সেটি এখন আকাশ ছুঁয়েছে।

বলছি ফোর্ড মোটর কোম্পানির কথা।

ফোর্ডকে বলা হয় 'আমেরিকান আইকন'। এক সময় জনপ্রিয়তায় কোক-ম্যাকের চেয়ে এগিয়ে থাকা ফোর্ডের বয়স ১০০ পেরিয়েছে গত বছর। মিশিগানের ছোট্ট এক কারখানায় জন্ম নেয়া কোম্পানিটি সময়ের পরিক্রমায় পরিণত হয়েছে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম অটোমোবাইল জায়ান্টে। ফোর্ড ছাড়াও অ্যাস্টন মার্টিন, জাগুয়ার, লিংকন, মার্কারি এবং ভলভোর মতো নামী-দামী ব্র্যান্ডের গাড়ি বাজারজাত করে ফোর্ড মোটর কোম্পানি। আর বিশ্বের প্রায় প্রত্যেক মহাদেশেই রয়েছে ফোর্ডের আলাদা কারখানা।

কোয়াড্রিসাইকেলে বসে ফোর্ড

সম্পদের হিসাবে ফোর্ড বিশ্বের পঞ্চম এবং আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম মোটরগাড়ি নির্মাতা কোম্পানি, অন্যদিকে রাজস্ব আয়ের দিক থেকে দ্বিতীয়। ফোর্ড মোটর বিশ্বের সর্ববৃহৎ পিকআপ ট্রাক নির্মাতা। অন্যদিকে মোটরকার ও ট্রাক নির্মাণের হিসাবে কেবল জেনারেল মোটরসের পরেই এর স্থান। ফোর্ড মোটর কোম্পানির বাৎসরিক নিট আয় ২০০ কোটি ডলার। বিশ্বব্যাপী শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা ৩ লাখের ওপরে।

উপাত্তগুলো থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, বিশ্বের অটোমোবাইল মার্কেটে ফোর্ডের অবস্থান কতটা শক্ত। এ অবস্থান একদিনে তৈরি হয়নি। ১৯০৩ সালের ১৬ জুন কোম্পানি হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর বহু চড়াই-উৎরাই পাড়ি দিতে হয়েছে ফোর্ড মোটর কোম্পানিকে। এই কঠিন সময়ে সামনে থেকে যিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি হেনরি ফোর্ড।

১৮৬৩ সালের জুলাই মাসে মিশিগানের গ্রিনফিল্ডের কাছেই জন্ম ফোর্ডের। কৃষক পরিবারে বেড়ে উঠলেও ফোর্ডের আশৈশব আগ্রহ ছিল যন্ত্রপাতিতে। ছোটবেলায় হাতের কাছে যা পেতেন তাই খুলে ফেলতেন। ঘড়ির মেকানিক হিসেবে নাম কামিয়েছেন অল্প বয়সে।

যন্ত্রপাতি নিয়ে নিরন্তর গবেষণার ফসল হিসেবেই ১৮৯৬ সালের গ্রীষ্মে ফোর্ড আবিষ্কার করেন চার অশ্বশক্তির ইঞ্জিনচালিত গাড়ি। নাম দেন 'কোয়াড্রিসাইকল রান অ্যাবাউট'। আজকের দিনের হিসেবে ঠিক মোটরগাড়ি বলা চলে না এই চারচক্রযানকে। এটা দেখতে ছিল অনেকটা 'ঘোড়াবিহীন ঘোড়ার গাড়ির' মতো।

এই চারচক্রযান ব্যাপক প্রশংসিত হওয়ায় ফোর্ডের মনে ব্যবসায়িক চিন্তা ঢোকে। হাতে মোটেও টাকা-পয়সা ছিল না। ফোর্ড প্রকৌশলী হিসেবে কাজ করছিলেন 'এডিসন ইল্যুমিনেশন কোম্পানিতে'। ইতিমধ্যে ক্লারাকে বিয়ে করেছেন। ছেলেও হয়েছে একটা।

'কোয়াড্রিসাইকল'টি ২০০ ডলারে বিক্রি করে দেন ফোর্ড আরেকটি গাড়ি তৈরির খরচ মেটাতে। ১৮৮৮ সালে তৈরি করেন এটি। নতুন শতাব্দীর শুরুতেই ১১ জন শেয়ার হোল্ডারের কাছ থেকে

এমবিএ করে এখন জাপানের নামকরা মোটর নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান 'মাজদা'-য় কর্মরত। মিজানের স্ত্রী ডেইজিও উচ্চশিক্ষিতা। ওরা দু'জনই আমার কবিতার ভক্ত। আমাকে আগেরবারই ডেইজি হিরোশিমায় যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তখন যাওয়া হয়নি। এবার হিরোশিমায় যাচ্ছি। ওরা দুজনই ওদের দূর পরবাসে আমাকে কিছু সময়ের জন্য কাছে পাবে ভেবে খুব খুশি।

আমার হোস্ট সিজুকার আন্তর্জাতিক ভাষা স্কুলের মালিক মি. সুয়েতসুগো আমাকে ১৫ হাজার ইয়েন দিয়ে কিয়োটো-হিরোশিমা এবং হিরোশিমা-সিজুকার সিনকানসেনের অগ্রিম টিকিট কিনে দিয়ে দুপুরের দিকে কিয়োটো থেকে সিজুকায় ফিরে গিয়েছেন। আর বিকেলের দিকে আমাকে হিরোশিমামুখী বুলেট-ট্রেনে তুলে দিয়েছে বাংলাদেশের তরুণ শিল্পী শিপু। শিপু কোত্থেকে? শিপু ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এনিমেশন ফিল্মের ওপর মাস্টার্স ডিগ্রি করছে। শিপুর সঙ্গে মিজান ও ডেইজির মুঠোফোনে কথা হয়। স্থির হয়, আমি একাই যাবো হিরোশিমায়। মিজান আমাকে হিরোশিমা রেল স্টেশন থেকে খুঁজে নেবে।

জাপানে ভয়ের কিছু নেই। জাপানে কেউ হারায় না, কিছু হারায় না। আমার ব্যাগটি ট্রেনে রেখে আমি নেমে গিয়েছিলাম সিজুকায়। ঐ ব্যাগ চলে যায় ট্রেনের অন্তিম গন্তব্য ওসাকায়। অন্য যেকোনো দেশে হলে ভয় পেতাম, কিন্তু জাপান বলেই ভয় পাইনি। জানি, আমার ব্যাগ কেউ ধরবেও না। টাকাভর্তি মানিব্যাগ যেখানে ফেরত পাওয়া যায়, সেখানে আমি অকারণে হারাবার ভয় পাবো কেন?

ফোনে ওসাকা স্টেশনের সঙ্গে কথা হয় আমার ব্যাগের ব্যাপারে। পাসপোর্ট-ভিসা আর বিমান-টিকিটসহ আমার ব্যাগ যথারীতি ওসাকায় পাওয়া যায়। বাংলাদেশের শিল্পী শিপু ওসাকা থেকে কিয়োটোতে আবির্ভূত হয়েছিল আমার ঐ হারানো ব্যাগটি সঙ্গে নিয়েই। আর আমি তো বহু দেশ ঘোরা, কথা বলতে পারা মানুষ। আমার পক্ষে হারানোর জন্য পৃথিবীটা খুব না হলেও বেশ ছোটই মনে হয়। আমাকে অনেকের ভিড়েও আবিষ্কার করা সম্ভব। জাপানিদের মুখে দাড়ি না থাকায়, জাপানে আমাকে খুঁজে পাওয়াটা আরও সহজ।

২৮ হাজার ডলার সংগ্রহ করেন। আত্মপ্রকাশ করে ফোর্ড মোটর কোম্পানি। কোম্পানির প্রথম চেয়ারম্যান ডেট্রয়েটের ব্যাংকার জন এস গ্রে, ফোর্ড যোগ দেন প্রধান ডিজাইনার হিসেবে।

প্রথম থেকেই ফোর্ডের ইচ্ছে ছিল সহজলভ্য গাড়ি বাজারজাত করার। আত্মপ্রকাশের এক মাস পরেই প্রথম গাড়িটি সরবরাহ করা হয় ডেট্রয়েটের এক ব্যাংকারের কাছে। প্রথম বছর ফোর্ড বাজারে ছাড়ে ১৭০৮টি কার।

গাড়ির মডেলের নাম রাখার জন্য ইংরেজি বর্ণমালার প্রথম ১৯টি অক্ষর বেছে নেয়া হয়। সর্বপ্রথম যে গাড়িটি ছাড়া হয় সেই মডেলটির নাম রাখা হয় 'মডেল এন রান অ্যাবাউট'। দাম রাখা হয় মাত্র ৫৭৫ ডলার। যা সে সময় মার্কিনিদের গড় মাথাপিছু আয়ের অর্ধেক। ১৯০৮ সালে বাজারে আসে আরো একটি গাড়ি 'মডেল টি' নামে। এর মূল্যও যথারীতি নাগালের মধ্যে। মাত্র ৬০০ ডলার। এ সবগুলো মডেলের ডিজাইন করেছিলেন ফোর্ড নিজে। ইতিমধ্যে অবশ্য ফোর্ড নিজে কোম্পানির চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণ করেছেন। কমদামী গাড়ি তৈরি নিয়ে শেয়ার হোল্ডারদের সঙ্গে মতদ্বৈততা দেখা দিলে ফোর্ড কোম্পানির ৫৮.৫ শতাংশ শেয়ার কিনে নেন।

ফোর্ড কোম্পানি যে সময় গাড়ি বানাতে শুরু করে, সে সময় মিশিগানেই ১৫টি কার নির্মাতা কোম্পানি ছিল। পুরো দেশে ছিল ৮৮টি। তাই শুরু থেকেই দারুণ প্রতিযেগিতার মুখে ছিল ফোর্ড। দাম জনসাধারণের নাগালে রাখার যে কৌশল ফোর্ড নেন, সেটি কাজে দেয়। প্রথম মাস থেকেই লাভের মুখে দেখে সদ্যোজাত ফোর্ড মোটর কোম্পানি। ১৯ বছরে 'মডেল টি' বিক্রি হয় ১ কোটি ৫০ লাখ ইউনিট।

মোটরগাড়ি শিল্পে ফোর্ড কোম্পানির সবচেয়ে বড় অবদান চলমান অটোমোবাইল লাইন উদ্ভাবন! এর ফলে শ্রমিকরা এক স্থানে দাঁড়িয়ে থেকে গাড়ির যন্ত্রাংশ সংযোজনের কাজ করতে সক্ষম হয়। ফলে কোম্পানির উৎপাদন বেড়ে যায় বহুগুণ। ১৯১৩ সালে গাড়ির যন্ত্রাংশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে আনা-নেয়ার এই মেশিন চালু করা হয়।

তবে দুটো বিশ্বযুদ্ধ ফোর্ড মোটর কোম্পানিকে দারুণ চাঙা করে তোলে। ১৯১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেবার পর ফোর্ড কোম্পানি সামরিক যান তৈরিতে পূর্ণশক্তি নিয়োগ করে। যুদ্ধ শেষ হলে ফোর্ড পুনরায় বাণিজ্যিক গাড়ি নির্মাণে ফিরে আসে। ইতিমধ্যে ফোর্ডের বড় ছেলে এডসেল ব্রায়ান্ট ফোর্ড কোম্পানির প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নিয়েছেন। ছেলের তাগাদায় ফোর্ড আবারও গাড়ির ডিজাইন করেন। ১৯২৭ সালে প্রদর্শিত হয় এই নতুন গাড়ি 'মডেল এ'। ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায় গাড়িটি। ১৯৩২ সালে ভি-৮ ইঞ্জিনযুক্ত 'মডেল বি' বাজারে আসার আগে ৪৫ লাখ ইউনিট বিক্রি হয়ে যায় 'মডেল এ'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ফোর্ড কোম্পানি পুনরায় সামরিক যান তৈরি করতে শুরু করে। যুদ্ধ চলাকালীন ১৯৪৩ সালের ২৬ মে কোম্পানির প্রেসিডেন্ট এডসেল মারা গেলে আশি বছর বয়স্ক হেনরি ফোর্ড পুনরায় কোম্পানির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৪৫ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে নাতি হেনরি ফোর্ডের কাছে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। ৮৩ বছর বয়সে ১৯৪৭ সালের ৭ এপ্রিল মারা যান ফোর্ড।

অটোমোবাইল শিল্পে ফোর্ড কোম্পানির মতো দূরদর্শিতার পরিচয় খুব কম প্রতিষ্ঠানই দিতে পেরেছে। ১৯১৪ সালে কোম্পানিটি শ্রমিকদের মধ্যে লভ্যাংশ বিতরণের ঘোষণা দেয়। শ্রমিকদের বেতন দৈনিক ৫ ডলার নির্ধারণ করা হয়। ১৯২৫ সালে ফোর্ড মোটর বিলাসবহুল গাড়ি নির্মাণের দিকেও ঝোঁকে। লিংকন মোটর কোম্পানিকে কিনে নেয় তারা। ৩০-এর দশকে মাঝারি দামের গাড়ি ছাড়ার জন্য 'মার্কারি' ব্র্যান্ডটিও কিনে নেয় ফোর্ড। ১৯৫৬ সালে ফোর্ড পাবলিক লিমেটেড কোম্পানি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং ৩ লাখ ৫০ হাজার নতুন শেয়ার ছাড়ে। ৫০ ও ৬০-এর দশকে ফোর্ডের পৌত্র হেনরি ফোর্ডের উদ্যোগে ফোর্ড মোটর বিশ্বব্যাপী ব্যবসা বিস্তৃত করে। সম্মিলিত ইউরোপীয় অর্থনীতি সৃষ্টির ২০ বছর আগেই ১৯৬৭ সালে সমগ্র ইউরোপের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয় 'ফোর্ড অব ইউরোপ'। উত্তর আমেরিকার উন্মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির দুই দশক আগেই যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকোর বাজারের জন্য ১৯৭১ সালে ফোর্ড চালু করে 'নর্থ আমেরিকান অটোমোটিভ অপারেশনস'। বর্তমানে ফোর্ড মাজদা, অ্যাস্টন, মার্টিন, ল্যান্ড রোভার এবং ভলভোর মতো নামী-দামী ব্র্যান্ডের গাড়ি তৈরি ও বাজারজাত করছে। মাজদার ৩৩ ভাগ শেয়ার ফোর্ডের। অন্যদিকে বিএমডব্লিউর ল্যান্ড রোভার (এসইউভি) তৈরির স্বত্ব এককভাবে কিনে নিয়েছে ফোর্ড। এছাড়াও কার ভাড়া দেয়ায় বিশ্বের ১ নং ফার্ম 'হার্টজ'র মালিকও ফোর্ড। এ ছাড়া 'ফোর্ড মোটর ক্রেডিট' হচ্ছে বিশ্বের ১ নং মোটরগাড়ির ঋণ ও অর্থলগ্নিকারক প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া ১৯৩৬ সালে হেনরি ফোর্ড এবং পুত্র এডসেল মিলে জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠা করেন ফোর্ড ফাউন্ডেশন। বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম এই মানবহিতৈষী সংস্থা দেশে দেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছে।

হাসান মূর্তাজা

এক নজরে ফোর্ড মোটর কোম্পানি

প্রতিষ্ঠা : ১৬ জুন, ১৯০৩
প্রতিষ্ঠাতা : হেনরি ফোর্ড
বর্তমান চেয়ারম্যান ও সিইও : উইলিয়াম ক্লে ফোর্ড, জুনিয়র
প্রেসিডেন্ট ও পরিচালক : স্যার পঞ্চম নিকোলাস
সিওও, ফোর্ড মোটর, চেয়ারম্যান, অটোমোটিভ অপারেশনস : জেমস প্যাডিল্লা
রাজস্ব আয় (২০০৩) : ১৬ কোটি ৪২ লাখ ডলার
রাজস্ব বৃদ্ধি (১ বছরে) : ০.৫০%
কর্মচারী (২০০৩) : ৩২৭.৫৩১
কর্মচারী বৃদ্ধি (১ বছরে) : -৬.৫০%
বাজার মূল্য : ২৭০০ কোটি ডলার
বাজারে অবস্থান : ৫ম
বিক্রির দিকগত অবস্থান : ২য়

ফলে, মিজান হিরোশিমা রেলস্টেশনে খুব সহজেই আমাকে পেয়ে গেলো। এর আগে মিজান আমাকে শুধু ছবিতেই দেখেছে। মিজানের প্রাণখোলা হাসিমুখ দেখে আমিও শনাক্ত করতে পারলাম, ও যথার্থই ডা. আবদুর রহমান পাখির ভাই। কোনো ভুয়া লোক আমাকে নিয়ে যাচ্ছে না। জানলাম, সিরাজুল আলম খানকেও সে একবার হিরোশিমা স্টেশন থেকে আমার মতোই নির্ভুল তুলে নিয়েছিল। এ কাজে সে বেশ অভিজ্ঞ।

হিরোশিমা থেকে একটা লোকাল ট্রেন ধরে আমরা একেবারে মিজানের বাসার কাছের স্টেশনে গিয়ে নামলাম। জায়গাটার নাম নাকানো, আকি-কু। কিছুটা পথ পায়ে হেঁটে মিজানের দোতলা বাসা।

ডেইজির হাসিমুখ, ওদের ছোট মেয়েটির সান্ধ্যকালীন কান্না আর ওদের বছর দশেকের ছেলেটির সদ্য শেখা ভব্যতার নিদর্শন হিসেবে প্রদত্ত আসসালামু আলাইকুমের মধ্যে সম্পন্ন হলো আমার হিরোশিমায় গৃহপ্রবেশ পর্ব। অনেক দিন পর ইসলামী কায়দায় সম্মান প্রদর্শন করার মতো শুভ্রশ্মশ্রুমন্ডিত একজন যথার্থ মৌলানাকে হাতের কাছে পাওয়ায় মিজানের ছেলেটিকে খুব খুশি বলেই মনে হলো। তা না হলে আমাকে সে এতো ঘন ঘন সালাম দিতো না।

হিরোশিমায় কাজী ইসলামের বাড়ির সামনে *ছবি : নির্মলেন্দু গুণ*

নিচের তলায় আমার রাত্রিবাসের চমৎকার ব্যবস্থা। কফি খেতে খেতে ভাবছিলাম, হিরোশিমায় যারা আমার সঙ্গে পরিচিত হতে আগ্রহী, তারা মিজানের বাসায় নিশ্চয় আসবে। এখানেই জম্পেশ আড্ডা হবে রাতে। আর বাইরে বেরুতে হবে না। কিন্তু না। মিজান বললো, আমরা আপনাকে নিয়ে অন্য একটা জায়গায় যাবো, জায়গাটা শহরের মাঝখানে। ওখানে আরও কয়েকজন আসবে আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে। আমার বাসাটা শহরের এক প্রান্তে। তা না হলে আমার বাসাতেই সবাইকে আসতে বলতাম। ওখানেই আমাদের ডিনার হবে। তা ছাড়া আসা-যাওয়ার পথে রাতের হিরোশিমা শহরটাও আপনার কিছুটা দেখা হয়ে যাবে।

শরীরে না ধরলেও মিজানের প্রস্তাব আমার খুবই মনে ধরলো। কাল সকালের দিকে পরমাণু বোমার ধ্বংস-স্মারক দর্শন করে, বিকেলের দিকে সিজুকায় ফিরে যাবো। রাতের হিরোশিমা নগরী দেখার আর সুযোগ হবে না। সময় নষ্ট না করে দ্রুতই বেরিয়ে পড়লাম হিরোশিমার পথে। মিজানের গাড়ি ছুটে চলেছে আলোকোজ্জ্বল পরিচ্ছন্ন এমন এক আশ্চর্য রূপসী নগরীর বুক চিরে, কে বলবে, এই নগরীর নামই হিরোশিমা? যে দিকে তাকাই, চোখে পড়ে সুন্দর, কেবলই সুন্দর। আনন্দে মন ভরে যায়। বুঝতে পারলাম, জাপানিরা তাদের সমস্ত প্রযুক্তিশক্তি, সুন্দরের অনুভূতি ও পরাজয়ের মর্মবেদনাকে মুক্তি দিয়েছে তাদের অন্তরের সবচেয়ে বড় ক্ষতস্থানটিতে। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এটম বোমা ফেলে আমেরিকা যে-নগরীটিকে জাপানের মানচিত্র থেকে মুছে দিতে চেয়েছিল, জাপানিরা সেই নগরীটিকেই পরিণত করতে চেয়েছে পরমাণু ভস্মের ভিতর থেকে মাথা তুলে দাঁড়ানো জাপানিদের অদম্যশক্তির প্রতীক-নগরীতে। হিরোশিমার স্কাইলাইন দেখে মনে হলো এ-নগরী যেন জাপানের নয়, আমেরিকার বা ইউরোপের। আমরা যাবো নাকা-কু। মিজানের বাসা আকি-কু থেকে বিশ কিলোমিটারের পথ। এর মধ্যেই বেশ কিছু ব্রিজ পড়লো পথে। নিচের টলটলে নদীজলে বিদ্যুতের আলোয় সজ্জিত নিশি-হিরোশিমার কম্পমান ছায়া।

চোখের তৃষা না মিটতেই ফুরিয়ে গেলো আমাদের পথ। আমাদের গাড়ি দাঁড়ালো মার্কিনী আদলে গড়া একটা চমৎকার ছয়তলা বাড়ির সামনে। ঐ বাড়ির সর্বোচ্চ তলায় বাস করেন এক তরুণ বাঙালি, নাম কাজী ইসলাম। আসার পথে মিজান ও ডেইজীর মুখে এই কাজী-দম্পতির অনেক প্রশংসা শুনেছি। কাজীর স্ত্রীর নাম রিয়া। কাজী ইসলাম ফোর্ড কোম্পানিতে কাজ করেন। মিজান মাজদায়। এই দুটি বড় কোম্পানি এখন জয়েন্ট ভেনচারে মিলিতভাবে গাড়ি তৈরি করছে বিশ্ববাজারে আরও বেশি করে আধিপত্য বিস্তারের আশায়।

কাজী দম্পতি নিচে নেমে এসে আমাদের হাসিমুখে স্বাগত জানালেন। পাঁচতলায় একটি মস্তবড় ফ্ল্যাটে থাকেন এই নব-দম্পতি। সদ্যবিবাহিত বলে মনে হয়। মনে হয় মেইড

ফর ইচ আদার। ফ্ল্যাটটি চমৎকার সাজানো-গোছানো। ঢাকার বড়লোকদের বাড়িঘরের মতো। আরামপ্রদ সোফায় গা গড়িয়ে আর পা ছড়িয়ে বসতে পারলাম। বেশ কিছুদিন পর মাথা উঁচু করে হাঁটতে পেরে খুব ভালো লাগলো। বারান্দায় দাঁড়িয়ে হিরোশিমা নগরীর অনেকটাই দেখা যায়। ভারী সুন্দর লাগে।

ফ্ল্যাটের পাশ দিয়েই বয়ে চলে গেছে কিয়োবাশি-গাওয়া। গাওয়া মানে নদী। নদীর ওপর একটু পরে পরে ব্রিজ। জাপানে নদীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটা বড় মধুর। ব্রিজের পর ব্রিজ তৈরি করে ওরা নদীর দুই তীরকে এমনভাবে যুক্ত করে দিয়েছে, যে নদীর সামনে এসে কীভাবে পার হবো এ-ভবনদী? এরকম ভেবে বাঙালির মতো জাপানিরা থমকে দাঁড়ায় না। কখনও কখনও মনে হয় বুঝিবা ব্রিজটাই পুরনো, নদীটা নতুন।

এরই মধ্যে পরিচয় হলো ডেন্টিস্ট জয়নাল আবেদীন ও ওর স্ত্রী ফারজানার সঙ্গে। মুজিবুর রহমান ও উনার স্ত্রী আরিফার সঙ্গে। আরও একজন ডেন্টিস্ট এসেছিলেন, নামটা ঠিক মনে পড়ছে না। সম্ভবত মিলন। ঢাকার বংশালে উনার একটি ক্লিনিক আছে। মুজিবুর স্ট্যাটিসটিকসে পিএইচডি করছে। মনবসু স্কলারশিপ নিয়ে ওরা জাপানে পড়তে এসেছেন। জাপানে স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে আসা আর চাকরি করার মধ্যে খুব পার্থক্য নেই। বৃত্তির পাওয়া অর্থ থেকে প্রতি মাসে বেশ কিছু অর্থ বাঁচে।

গৃহকর্তা কাজী ইসলামের ডাক নাম দিপু। দিপু বাংলাদেশের বাঙালি। এখন তিনি আমেরিকার নাগরিকও। ফোর্ড কোম্পানিতে কাজ নিয়ে কিছুদিন ধরে জাপানের হিরোশিমায় কোম্পানির দেয়া ফ্ল্যাটে রাজার হালে আছেন। বুঝলাম বিশেষ প্রতিভা না থাকলে ফোর্ড কোম্পানি এমন তরুণকে এরকম লোভনীয় চাকরি দিতো না।

তখন দুটো চমৎকার ট্রফি আমার হাতে তুলে দিয়ে কাজী জানালেন, আমেরিকায় থাকতে এ-দুটো ট্রফি তিনি তাঁর ভালো কাজের জন্য লাভ করেছেন। জানতে চাইলাম সেই ভালো কাজটা কী? তখন কাজী জানালেন, তিনি ফোর্ড কোম্পানিতে মোটরের জন্য নতুন ইঞ্জিন তৈরি করা ও তার ডিজাইন করার কাজের সঙ্গে যুক্ত। শুনে খুবই অবাক হলাম। খুব ভালো লাগলো শুনে।

আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরা বিদেশে গিয়ে অনেকেই প্রচুর অর্থবিত্তের মালিক হন। নাগরিকত্ব পেয়ে বিদেশেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। কিন্তু তাদের মধ্যে বিশেষ কৃতীর পরিচয় দিয়ে বাঙালি হিসেবে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করতে পারেন, তেমন বাঙালির সংখ্যা খুবই কম। টোকিওতে দেখা এমনি আরেকজন তরুণের কথা মনে পড়লো। তাঁর নাম আসির আহমদ, পিএইচডি। জাপান থেকে টেলিকমুনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পড়াশোনা করে এখন জাপানের রাষ্ট্রীয় সংস্থায় কাজ করছেন। তিনি আন্তর্জাতিক টেলি-সম্মেলনে বিদেশে গিয়ে জাপানের প্রতিনিধিত্ব

কাজী ইসলাম দম্পতির সঙ্গে লেখক

করেছেন বেশ ক'বার। কাজীর মতো তার ভাগ্যে এখনও তেমন পুরস্কার না জুটলেও, অচিরেই জুটবে বলে আমি আশা রাখি।

হিরোশিমা থেকে দেশে ফিরে আসার পর আমি কাজী ইসলামের অর্জিত সাফল্যের কথা দেশবাসী, বিশেষ করে দেশের তরুণ-প্রজন্মকে জানাবার সিদ্ধান্ত নিই। তাতে আমাদের তরুণ প্রজন্ম কিছুটা হলেও অনুপ্রাণিত হবে। আর আমরা যারা বিদেশীদের তৈরি করা গাড়িতে চড়ে বাহাদুরি করি, তারাও বলতে পারবেন, আমাদের একজন অন্তত আছেন, যিনি মোটর গাড়ি বানাতে পারেন।

জাপানের মাজদা মোটর কোম্পানিতে কর্মরত আমাদের মিজানুর রহমানও খুব গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন। কীভাবে গাড়ি তৈরি হয়, তা দেখানোর জন্য তিনি আমাকে মাজদা মোটর ফ্যাক্টরিতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও সময়াভাবে সেখানে যাওয়া হয়নি। মিজানও খুবই প্রতিভাবান। তবে কাজী ইসলামের মতো তাঁর কাজের জন্য তিনি এখনও কোনো গুরুত্বপূর্ণ ট্রফি পাননি। একদিন নিশ্চয়ই তিনিও পাবেন। ফোর্ড যখন পেয়েছে, মাজদাও পাবে।

আমি দেশে ফিরে কাজীকে আমার ইচ্ছের কথা জানিয়ে লিখি :

'প্রিয় দিপু, আপনার বিরল সাফল্যের কথা আমি অনেককে মুখে বলেছি। যে কোনো দেশের তরুণের জন্যই এ এক বড় সাফল্য। আমাদের দেশের মানুষ যখন আপনার কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের কথা জানবে, তখন সবাই গর্ব বোধ করবে। গর্ব করবার মতো খুব বড় রকমের অর্জন তো আমাদের খুব বেশি নেই। আপনি আপনার কর্ম ও সৃষ্টির সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখে ভবিষ্যতে আরও বড় রকমের সাফল্য অর্জন করবেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সূর্য কোথায় উঠলো, সে প্রশ্ন কে করে? সে তো সারা পৃথিবীকেই আলো দেয়, তার এই পরিচয়টাই বড়। যেকোনো বড় সৃষ্টিই সারা বিশ্বের সম্পদে পরিণত হয়। আমি আপনার কৃতীর কথা আমাদের দেশের মানুষকে জানাতে চাই। তাতে আমাদের দেশের মেধাবী তরুণ-তরুণীরা অনুপ্রাণিত হবে। তাদের মনের হীনন্মন্যতা কিছুটা হলেও কাটবে। তারা নিজের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবে।

আপনার সম্পর্কে কিছু লিখতে চাই আমি। আশা করি প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে আপনি আমাকে লিখতে সাহায্য করবেন।'

আমার ইচ্ছাপূরণের জন্য কাজী ইসলাম আমাকে নিজের সম্পর্কে যেসব প্রাসঙ্গিক তথ্য দিয়েছেন, সে-তথ্যগুলো ওঁর নিজ-জবানিতে এরকম :

'আমি খুব খুশি হয়েছি জেনে, যে আমার ডিজাইনকৃত ফোর্ডের গাড়ির ছবি আপনার বেশ পছন্দ হয়েছে। আশা করছি, আমি আগে যে সব গাড়ির নির্মাণকর্মে আরও অনেকের সঙ্গে কাজ করেছি সেইসব গাড়ির মতোই এ-গাড়িটিও বিশ্ববাজারে ভালো সাড়া পাবে। আপনি যদি এ-সম্পর্কে কিছু লেখেন, বা আপনার কোনো লেখায় আমার কথা উল্লেখ করেন, তবে তা আমার জন্য খুবই সম্মানের বিষয় হবে।

আপনি আমার শিক্ষাজীবন ও কর্মজীবন সম্পর্কে কিছু তথ্য জানতে চেয়েছেন। আমার শিক্ষাজীবনের চিত্রটা এরকম : 'আমার জন্ম ১৯৭০ সালে। আমি সিলেট ক্যাডেট কলেজের ছাত্র ছিলাম। সেখান থেকে আমি এসএসসি পাস করি। আমি কুমিল্লা বোর্ড থেকে এসএসসি পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৪র্থ স্থান লাভ করি। এইচএসসি-তে আমি সামান্য নম্বরের জন্য মেধা-তালিকায় কিছুটা নিচে নেমে যাই। তারপর ১৯৮৯ সালে আমি চলে যাই আমেরিকায়। সেখানে স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে যথাক্রমে ইলেকট্রিক্যাল ও

কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ আমি ডবল ব্যাচেলর ডিগ্রি লাভ করি। ডিগ্রি-পর্যায়ে পড়াশোনা করার সময় আমি বিভিন্ন কোম্পানিতে কাজ করেছি, তার মধ্যে ফোর্ড কোম্পানিও ছিল। ফোর্ড কোম্পানির কাজটা আমার এতো ভালো লাগছিল যে, আমার গ্র্যাজুয়েশন লাভের এক বছর আগে আমাকে ফোর্ড কোম্পানি পূর্ণ সময়ের জন্য চাকরিতে যোগ দেবার প্রস্তাব করলে, মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে আমি চাকরিটা লুফে নিই। তারপর আমি মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথমে সিস্টেমস ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ও পরে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করি।

ফোর্ড কোম্পানিতে গত আট বছর ধরে আমি কাজ করছি।

জাপানে মাজদা কোম্পানির সঙ্গে গৃহীত যৌথ-প্রকল্পের বর্তমান কাজে যোগদানের আগে, আমি ফোর্ডের পক্ষে ব্রিটেনের বিখ্যাত জাগুয়ার পাওয়ার ট্রেন কোম্পানিতে কাজ করেছি। সেখানে আমার কাজ ছিল, জাগুয়ার ও ফোর্ড দুই কোম্পানির জন্যই ইঞ্জিন তৈরি করা।

আমার বিশেষ দায়িত্ব ছিল ফোর্ড কোম্পানির জন্য ভি-৮ ইঞ্জিনটিকে সমৃদ্ধ করা। সেই ইঞ্জিনটি ২০০০ সালের ১০টি সেরা ইঞ্জিনের একটি হিসেবে পুরস্কৃত হয়। অই ইঞ্জিনটিকেই পরে ২০০০ Model Year Lincoln LS-এর জন্য আরও উন্নত করা হয়।

একই বছরে ফোর্ডের ভাগ্যে আরও একটি সম্মানজনক পুরস্কার জোটে। নর্থ আমেরিকার সেরা গাড়ি হিসেবে ফোর্ড অর্জন করে মোটর ট্রেন্ড অ্যায়োয়ার্ড-২০০০। লিড সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে ফোর্ডের হয়ে আমিই এই পুরস্কারগুলো গ্রহণ করি। আপনি আমার হিরোশিমার বাসায় অই পুরস্কারের ট্রফিগুলোই দেখেছেন।

২০০২ সালে আমরা ভি-৮ ইঞ্জিনটির বেশ গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার সাধন করি। এই ইঞ্জিনটি 'থান্ডারবার্ড' নামে আরেকটি ফোর্ড-গাড়িতে ব্যবহার করা হয়। বেশ কয়েক বছর বাজারের বাইরে থাকার পর, নতুন করে বাজারে এসে থান্ডারবার্ডও বাজিমাৎ করে। নর্থ আমেরিকান মোটর ট্রেন্ড অ্যায়োয়ার্ড-২০০২ জুটে যায় তার ভাগ্যে।

আমি ভাবি, খুব ভাগ্যবান বলেই ফোর্ড কোম্পানির ইঞ্জিন তৈরির প্রকল্পে আমি কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। তাই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এতো মূল্যবান পুরস্কার আমার ভাগ্যে জুটেছে।

২০০৬ সালে যে গাড়িগুলো তৈরি হয়ে বাজারে যাবে, সেইসব গাড়ির ডিজাইন ও ইঞ্জিন নিয়ে আমি এখন মাজদা কোম্পানির সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছি।

আমি জন্মগ্রহণ করেছি বাংলাদেশে, কিন্তু আমার সচেতন বয়সটা কেটেছে আমেরিকায়। আর এখন কাটছে জাপানে। আমার মনে হয়, জাতীয়তা সম্পর্কে আমার মধ্যে এক ধরনের নিস্পৃহ অনাক্রম্যতা তৈরি হয়েছে। আমার ভাবনাগুলো খোলা আকাশের মতো, আমার ঔৎসুক্য নিরন্তর সৃষ্টিশীলতায়, আর কঠিন-চ্যালেঞ্জের সমাধানের মধ্যেই আমার আনন্দ। সম্ভবত আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমারও বিশ্বাস, আমি আমার যাত্রাপথকে আরও আলোকিত করবো। আগামী বছরের জুলাই থেকে ফোর্ড, মাজদা এবং লিঙ্কন আমাদের ডিজাইনকৃত নতুন গাড়িগুলো বাজারে ছাড়বে। এই গাড়িগুলো তৈরি হচ্ছে জাপান ও মেক্সিকোয়।

আমেরিকায় থাকতে এ-দুটো ট্রফি তিনি তাঁর ভালো কাজের জন্য লাভ করেছেন। জানতে চাইলাম সেই ভালো কাজটা কী? তখন কাজী জানালেন, তিনি ফোর্ড কোম্পানিতে মোটরের জন্য নতুন ইঞ্জিন তৈরি করা ও তার ডিজাইন করার কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকি। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে, গাড়ির ভিতরকার কারিগরি দিক, যেখানে অনেকগুলো জটিল সিস্টেম-ডিজাইন মিলে-মিশে পুরো গাড়িটাকে যথার্থভাবে কাজ করতে বাধ্য করে।

আমার সম্পর্কে আপনার প্রশংসাবাণী আমাকে খুব উদ্দীপ্ত করেছে।

আমার বিশেষ করে ভালো লেগেছে আপনার এই মন্তব্যটি : "It does not matter where the sun rises, it gives light to the world".

পরিশিষ্ট

আমি আপনাকে গাড়ি তৈরির ব্যাপারে কিছু জ্ঞান দিতে বাধ্য হচ্ছি। মোটর গাড়ি কিন্তু বেশ একটি জটিল মেশিন। কোনো ইঞ্জিনিয়ারই এককভাবে এমন দাবি করতে পারবেন না যে, তিনি একাই একটি মোটর গাড়ির সম্পূর্ণটা ডিজাইন করেছেন। কাজটি করতে হয় দলগতভাবে। সিস্টেমস লিডাররা পুরো বিষয়টি তদারকি করে থাকে। আপনার কাছে বিষয়টাকে আরও সহজ করার জন্য বলি: মোটর গাড়ির ডিজাইনের কম করেও দুটো ভিন্ন দিক রয়েছে। একটা হচ্ছে, গাড়িটির আর্টিস্টিক ডিজাইনের দিক, যা আমরা সবাই গাড়ির বাইরে থেকে দেখে

একটা গাড়িতে বিভিন্ন রকম যন্ত্রাংশ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই যন্ত্রাংশগুলো বিভিন্ন গ্রুপ অথবা প্রস্তুতকারক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তৈরি করে। একজন লিড সিস্টেমস ডিজাইনার হিসেবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে যন্ত্রপাতি সংযোজনের পর সেটি ঠিকমত কাজ করবে, এ বিষয়টি তদারকি এবং নিশ্চিত করা।

কোনো একটা গাড়িকে যখন কোনো পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়, তখন ঐ বিশেষ-গাড়িটির বিভিন্ন সিস্টেমের উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত সবাই ঐ কৃতিত্বের অংশীদার হিসেবে গণ্য হন। আমাদের বেলায় ঘটনাটি ঘটেছে এমন যে, আমি ঐ পাওয়ার ট্রেন সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার দলের প্রধান ছিলাম বলেই ফোর্ড কোম্পানির ২০০০ সালের লিংকন-এলএস এবং ২০০২ সালে ফোর্ড থান্ডার বার্ড গাড়ির জন্য প্রদত্ত পুরস্কার ২টি সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষে আমিই গ্রহণ করেছি এবং দলপতি হিসেবে এই পুরস্কারগুলো সর্বদা আমার হেফাজতেই থাকবে, যদিও এই পুরস্কারগুলো কখনই এককভাবে কোনো একজনের প্রাপ্য নয়। আমি বিশেষভাবে ভাগ্যবান এজন্য যে, একটি নয়, দু'দুটি পুরস্কার প্রাপ্ত গাড়ির বেলাতেই একজন লিড সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে আমি আমার ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করেছিলাম।

বর্তমানে আমার দায়িত্ব বদল হয়েছে। ফোর্ড কোম্পানিতে প্রতি ২/৩ বছর অন্তর দায়িত্ব বদলে দেয়া হয়, এটা করা হয় ভবিষ্যতের নেতৃত্ব তৈরির জন্য। পাশাপাশি এর ফলে একজন কর্মচারী কোম্পানির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা লাভ করে। বর্তমানে আমি জ্যানে ফোর্ড মোটর কোম্পানির পক্ষে মাজদার সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করার ব্যাপারটি দেখাশোনা করছি। ২০০৬ সালে যৌথভাবে যে চরটি ভিন্ন গাড়ি বাজারে ছাড়া হবে এর ইঞ্জিন ডিজাইনিং-এর পুরো ব্যাপারটি আমি তদারকি করছি।